সেই প্রথম দিনটা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

মহাশ্বেতাদির বাড়িতে আমাকে প্রথম নিয়ে যান 'প্রমা' পত্রিকার সম্পাদক অকাল প্রয়াত সুরজিত ঘোষ, ১৯৮০ সাল নাগাদ। সুরজিত ঘোষ বলেছিলেন মহাশ্বেতাদি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন।

ভীষণ আনন্দে তা তা থৈ থৈ করতে করতে গিয়েছিলাম। বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের আস্তানায় ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠেছিলাম। গঙ্গোত্রী হিমবাহ যাবার সময়ের ঘোরানো পাহাড়ি রাস্তাটার কথা মনে পড়েছিল। আমি কি তবে গোমুখে যাচ্ছি? গোমুখ থেকে গঙ্গা দুরন্ত সুন্দর বেশে এগিয়ে আসে। দরজা খুলে মহাশ্বেতা এগিয়ে এলেন, পরনে ম্যাক্সি—স্তন্যদায়িনী - হাজার চুরাশির মা — দ্রৌপদী।

প্রথম দেখি। সাইক্লোন বাতাস থমকে আছে ঐ কুঁচকানো ম্যাক্সির ভাঁজে। রোগা, ফর্সা, সস্তা ডাঁটির চশমা-পরা আমার মায়ের মতোই সাধারণ নারীর মধ্যে এত বারুদ? আমার শরীরের মধ্যে কে জানে কত রিকটারের কম্পন। আমার একটু ভয় হচ্ছিল। সুরজিত ঘোষের শরীরের পিছনে নিজেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করি। মহাশ্বেতা সুরজিত ঘোষকে দেখে বললেন, কিরে? কি ধান্দায়? বলে ওর কাঁধে হাত রাখলেন। হাসলেন। হাতে আপনজনের মুদ্রা। ডিগ্‌নিটারি সেলিব্রেটিরা এভাবেই হাসেন?

মহাশ্বেতাদি জিজ্ঞাস করলেন, সঙ্গে কে? সুরজিত বলেছিলেন, স্বপ্নময়। উনি তখুনি বললেন—'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' তুমি লিখেছ স্বপ্নময়? খুব ভাল, খুব।

তক্ষুনি আমি যেন হঠাৎ লম্বা হয়ে গেলাম, আবার ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে নিলাম হারমোনিয়ামের 'বেলো'র মত। বাজতে থাকি, বাজতে থাকি...এখনো বাজি।

মহাশ্বেতা বললেন, ভেতরে এসো। শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন বিকেল। রেডিওতে আস্তে করে বিবিধ ভারতী বাজছে। অযত্নরচিত বিছানা, বিছানার পাশেই লেখার টেবিল। গাদা গুচ্ছের বই, অনেক ফাইল, কি-সব ইকনমিক এবং স্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টের বই, —যে-সব বই সাহিত্যিকের টেবিলে থাকে না। রতন খাসনবীশদের টেবিলে থাকতে পারে। উল্টোদিকে আর একটা তক্তাপোস। ওখানে বসলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, বিড়ি খাবি?

কী যে বলি! যদি বলি 'না' তাহলে ভাবতে পারেন—আমি বিড়ি খাই না, সিগারেট খাই। সিগারেট তো বাবুগিরি। কিম্বা ভাবতে পারেন আমি অধূমপায়ী। তখন বিড়ি-সিগারেট না - খাওয়াটা ছিল ললিপপ মার্কা ছেলেদের লক্ষণ। আসলে আমি বিড়ি-সিগারেট যা পাই তাই খাই। কিন্তু গুরুজনদের সামনে খাই না। যদি বলি 'হ্যাঁ' সেটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? গুরুজনের সামনে ধূমপান না-করাটা কি সংস্কার? মানে কুসংস্কার? মানে রেসিডিউ অফ ফিউডাল কালচার?

নে নে, মৌনং সম্মতি লক্ষণম।

গুরুজনের সামনে, না—বন্ধুর সামনে,— না বন্ধুর সঙ্গে বিড়ি খেলাম।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দিনগুলো মানুষ ভোলে না। প্রথম সমুদ্রদর্শন ভুলিনি, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে আছে। প্রথম স্কুলে যাওয়া, প্রথম জলপ্রপাত...। সে রকমই মনে আছে সব 'লে গয়ি দিল গুড়িয়া জাপান কি' বাজছিল তখন। জিজ্ঞাসা করলাম, বিবিধ ভারতী শোনেন নাকি?

খুব শুনি। যখন লিখি, গান বাজে।

লেখার টেবিলটা বোধহয় খাবার টেবিলও। দুটো প্লেট উপুড় করা। একটা পিঁপড়ের লাইন ইঁটভাঁটা মজদুর সমিতির একগোছা হ্যান্ডবিলের পাশ দিয়ে মৃৎশিল্পী কল্যাণ সমিতির লেটার হেডের উপর দিয়ে উপুড় করা প্লেটের তলায় চলে গেছে।

১৯৮০ সালের কথা বলছি। এর আগে চাক্ষুষ কোন বড় সাহিত্যিক দেখিনি মণীন্দ্র রায় ছাড়া। বাগবাজারে থাকতাম, প্রথম গল্প বের হয় সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ৭২ নাগাদ। তখন সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্র রায়। অমৃতে এরপরেও একটা লিখেছিলাম। মণীন্দ্র রায় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, আরও লিখতে বলেছিলেন। কিন্তু কী যে ভূতে পেয়েছিল, পরের গল্পটা নিয়ে ছাপাবার জন্য 'চতুরঙ্গে' গেলাম, এরপর 'মধ্যাহ্ন'। বাগবাজারের ক্ষুদ্র কাগজ 'পাদপীঠ', আরও কি সব ছোটখাটো কাগজে লিখতাম। কফি হাউলে একদিন দূর থেকে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছিলাম, সুবিমল মিশ্র, অমল চন্দ, এদের। মনে মনে বুদ্ধদেব বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সবাইকে এক সারিতে রেখে দিতাম। শ্যামলের সঙ্গে তখনো মুখোমুখি দেখা হয়নি আমার। সত্তর দশকের অস্তি দিনগুলির অভিক্ষেপ পেতাম না মূলস্রোতের সেইসব বিখ্যাত লেখকদের লেখায়। খটখটে কাঠ ফুঁড়ে বসন্তের নতুন পাতা জেগে ওঠার মত নতুন স্বপ্নের উন্মেষ, নাঙা হাড় জেগে ওঠা, স্বপ্নচারণ, পুলিশ, কুম্বিং, বোমা-বারুদ-মৃত্যু, এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, এইসবের মধ্যে দিয়ে কাটছে আমাদের নবযৌবন, মূল পত্রপত্রিকার কথাসাহিত্যে তার প্রতিচ্ছবি পাচ্ছিলাম

না। মূলধারার লেখকদের কলমও উদাসীন। সে সময় দেবেশ রায়, অসীম রায়, কিছুটা দীপেন্দ্রনাথ এবং অবশ্যইই মহাশ্বেতার লেখায় পাচ্ছিলাম সময়ের ওম? জয়ন্ত জোয়ারদার, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, শৈবাল মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়রা সেই সময়টাকে ধরার চেষ্টা করছেন। অমর মিত্র, শচীন দাস—এরাও লিখতে শুরু করেছেন। আমি, অভিজিত সেন, ভগীরথ মিশ্র, কিন্নর রায়, সৈকত রক্ষিত এবং আরও অনেকে যে সব লেখা লিখছেন, সবার লেখার মধ্যেই দেখা যাচ্ছিল মাটি এবং মাটি - জড়ানো মানুষদের কথা। গল্পের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল রিপোর্টাজ, মিথ, লোককথা, আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কার, ধর্মাচরণ ইত্যাদি। সত্তরের যাদের বলা হয়, ওরা একসঙ্গে বসে কোন সেমিনার/ ওয়ার্কশপ করে লিখতে বসেননি, কিন্তু সবার লেখার মধ্যে একটা মিল ছিল, যদিও প্রত্যেকের লেখার শৈলী আলাদা আলাদা। মানুষের জীবনযুদ্ধের কথাই লিখতাম, কিন্তু প্রগতি সাহিত্য বলে যা বলা হয়, সেটা আমাদের মডেল ছিল না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে ছিল না। সে সময় মহাশ্বেতার লেখা আমার মধ্যে অনুরণন সৃষ্টি করতো। মনে হত এই লেখাই তো লিখতে চাই, এভাবেই তো ভেবেছি, কিন্তু ভেবে তো মানুষ দেখিনি, এভাবে তো মানুষ চিনিনি, চিনতে পারিনি। ওর লেখা বুকে ধাক্কা দিত। সবে মাত্র বেহুলা পড়েছি, কিছু কাল আগেই 'প্রমা'য় প্রকাশিত মাস্টারসাব উপন্যাস কিছুদিন আগেই অগ্নিগর্ভ, স্তনদায়িনী, মূর্তি ইত্যাদি লেখা দগদক করছিল সত্ত্বায়। ততদিনে আমিও ১২/১৪টা গল্প লিখে ফেলেছি। ১৯৭৪ থেকে ৭৬ পর্যন্ত ভুমিরাজস্ব দপ্তরে কাজ করে গ্রামবাংলার চেহারাটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। ওরকম অবস্থায় মহাশ্বেতার ঐ সময়ের লেখাগুলো পড়ে ওকে গুরুর আসনে বসিয়ে ফেলেছি। মনে মনে বিরাট ভেবেছি।

বললাম তো এর আগে কাছ থেকে বড় সাহিত্যিক দেখিনি। তখন টিভি এতটা হয়নি। সাহিত্যিকদের ছবি দেখেছি নবকল্লোলে। তখন নবকল্লোলে লেখার সঙ্গে সাহিত্যিকদের ছবি ছাপানো থাকতো। সিনেমাতেও সাহিত্যিক চরিত্র দেখতাম, অবচেতনে বড় সাহিত্যিকের ঘর ও টেবিল সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, দেয়ালে বইয়ের ভারে জবুথবু আলমারি, দেয়ালে মর্ডান আর্ট কিম্বা ছৌ মুখোশ, টেবিলের ডোকরা, ঘেরা হাতের চেটোয় চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলি স্থাপিত সাহিত্যিকের ইমেজ ভেঙে দিলেন মহাশ্বেতাদি। এরপর মহাশ্বেতা পাঠে ভাঙতে লাগল সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা, শব্দ সম্পর্কে...বাক্য সম্পর্কে... পরে শিল্পের এসথেটিক সম্পর্কে একটা নতুন চিন্তা করাতে লাগলেন মহাশ্বেতাদি।

সেই প্রথম দিনের কথা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। সে দিনই ওর মুখে অমর মিত্র এবং অভিজিত সেনের লেখার প্রশংসা শুনলাম। 'ওরা ভালো লিখছে' — এই কথা বলার সময় ওর চোখে মুখে সর্বসুখ দেখলাম। যেমন মায়েরা পুত্র - সাফল্যের কথা বলে। নবারুণ তখনো সেভাবে লিখছিলেন না। উনি একটু পরেই বোধহয় শুরু করেছিলেন। নবারুণ নাটকে বেশি মন দিয়েছিলেন প্রথম দিকে। এরপর নবারুণের পরপর কয়েকটি ভালো লেখা প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরা হিতসাধিনী হল-এ 'হাঁসখালির হাঁস' অভিনীত হ'ত, নবারুণের নির্দেশনায়। তখন একই ভাবে নবারুণের প্রশংসা করেছিলেন যে ভাবে অমর - অভিজিতের কথা বলেছিলেন।

সে দিন কফি খাইয়েছিলেন মহাশ্বেতাদি। সেই প্রথম দিনের কথাই বলছি। আর কিছু খাব কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সংকোচের সংকটে বিহ্বল। এ সময় একজন দাড়ি-না-কাটা আদিবাসী মানুষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই লোকটা মাথা আঁচড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত নম্বর যেন?' মহাশ্বেতাদি ১৬ কিম্বা ১৮ কিছু একটা বলেছিলেন। আমি দেখেছিলাম কি অবলীলায় লোকটা মহাশ্বেতাদির চিরুনিতে মাথা আঁচড়াতে পারছেন। অথচ কফির কাপে চুমুক দিতে আমি সংকোচে মরি। আসলে মহাশ্বেতাকে আপন করে নেবার অধিকার নিজেকেই অর্জন করে নিতে হয় কাজের মধ্যে দিয়ে। শুধু লেখায় নয়, বৃষ্টিজলের মতো তাবৎ মানুষের ডালপালায় শিকড়ে শিকড়ে নিজেকে ছড়াতে পেরেছিলেন মহাশ্বেতা। যেটা আমি পারিনি। আমার কি অধিকার আছে ওর সঙ্গে হেসে গল্প করার? ওর সময় নষ্ট করার?

দাড়ি-না-কাটা কালো মানুষটাকে দেখেছিলাম মহাশ্বেতাদির বড়ির অন্দরে। ওর হৃদয়ের অন্দরেও যে ওই মানুষরাই সেটা বারবার বুঝেছি বহু ঘটনায়।

শান্তিনিকেতনে একবার দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল পূর্বপল্লীর অতিথি নিবাসে। পৌষ মেলায়। যেভাবে কলকাতায় ভদ্রলোকরা স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে পৌষমেলা দেখতে যায়, আমিও সেভাবে গিয়েছিলাম। দিদির খাবার টেবিলে তিন চারজন হাভাতে চেহারার মানুষ। উনি টুক তরে হাতে শিরায় ইনজেকশন নিয়ে খেতে বসলেন। শেষ পাতে রসগোল্লা দেয় ওরা একটা। উনি একজনকে বললেন— আজ একটা খুব নে। শুনলাম মেলায় শবরদের একটা স্টল হয়েছে, উনি ওই স্টলে বসে শবরদের হাতের কাজ বিক্রি করছেন। মেলায় দেখলাম সত্যিই তাই। খদ্দেরদের বাবুই ঘাষের গুণপণা বোঝাচ্ছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে উনি নবারুণের মা। অকালপ্রয়াত চুনী কোটালেরও মা, খেড়িয়া - শবর - লোধাদের মা, মুণ্ডা সমাজের মাতৃসমা মারাং দাঈই (বড়দি) তিনি। মুরগি - মায়ের মত ডানার নিচে মহাশ্বেতা আগলে রাখেন দলিত সংগঠনগুলিকে। কষ্টে থাকা আদিবাসী মানুষদের জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন, এর মধ্যে একটা সংগ্রামী মাতৃত্বও কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যে মাকে পছন্দ করেননি—যে-মা 'বাঙালি' করেই রাখে, মানুষ করে না, মহাশ্বেতা

সেই বিপরীত ধারণার মা। রবীন্দ্রনাথের যে - মাকে দরকারী মনে হয়েছিল। কর্মসূত্রে ঝাড়খণ্ডে বছর চারেক থাকতে হয়েছিল। দেখেছি, এখানকার বেশ কিছু আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ব ওকে মায়ের মতই দেখে, যে-মা অভিভাবিকা।

আমি কথায় ও কাজে এক, বক্তৃতা ও ব্যবহারে এক — এমন মানুষ কমই দেখেছি। ওঁর জীবন ব্যবহার এবং কলম ব্যবহারের কোন গরমিল নেই। যা ভাবেন, তাই বলেন; যা বলেন, তাই করেন।

ওর বলা নিয়ে কিছু বলি। বলা মানে বক্তৃতা নয়, গল্প পড়া। একবার শিশির মঞ্চে একটা গল্পপাঠের আসরে ওর পড়া গল্প শুনেছিলাম। সেদিন বারবার শোনার সুযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে বেতারে চাকরি করার সুবাদে ওর পড়া গল্প শুনেছিলাম 'ভাত'। আমি টেপটা বারবার বাজিয়ে শুনেছি। কেঁদেছি। বারবার রিওয়াইন্ড করেছি। বারবার শুনেছি। যখন উচ্ছব দৌড়তে থাকে, ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে পুরো হাতটা ডুবিয়ে দেয়, মৃত স্ত্রী চুন্নুর নাম করে ভাত খায়—ছোট খোকা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা...। গল্পটি পড়ার সময় কী মায়া মমতা মেখে যায় গল্পটিতে। স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে গল্পটা শুনতে শুনতে কাঁদার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

'বর্ত্তিকা'র গ্রাহক হয়েছিলাম। বেশ কয়েক বছর 'বর্ত্তিকা' পেয়েছি। মহাশ্বেতা সম্পাদনা করতেন কাগজটার। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে 'বর্ত্তিকা'র একটা অন্য ভূমিকা আছে। 'বর্ত্তিকা'য় সমাজ-অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখা বের হ'ত। লোককথাও থাকতো। বড় বড় স্কলার লেখকদের পাশাপাশি ওখানে লিখতেন রিক্সাওলা, ভ্যানওলা, সদ্যসাক্ষর মৃৎশিল্পী, বিভিন্ন কারিগর। সবাই নিজেদের কথা নিজেদের মত করেই লিখতেন। ছাপা হ'ত চিঠিপত্র। স্যোলাস অন্‌থ্রোপলজির গবেষণার জন্য, 'বর্ত্তিকা'র সংখ্যাগুলি এক একটা সিন্দুকের মত। নিজের গল্প লেখার জন্য এখানে পুরনো 'বর্ত্তিকা'র সাহায্য নিই। 'বর্ত্তিকা'য় ভূমিদাস প্রথা নিয়ে একটা ধারাবাহিক লেখা লিখতেন উনি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমি একটা পোস্টকার্ডে ৫।৬ লাইনের প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তরে আমি একটা ৭।৮ পৃষ্ঠার চিঠি পেয়েছিলাম। আমি একেবারেই অগোছালো মানুষ। ওই চিঠিটা এখন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। যত্ন করেই কোথাও রেখেছি। কিন্তু কোথায় যে যত্নটা করেছি মনে করতে পারছি না।

১৯৭৪-৭৫ সালে আমি রীতিমত ভূমিদাস দেখেছি বর্দ্ধমান জেলায়। সারাজীবনেরই জন্য জোতদারদের বাড়িতে ওদের খাটতে হ'ত। মাহিন্দার বলা হ'ত ওদের। আমার কয়েকটা গল্পে মাহিন্দাররা এসেছে। নলিনী, অমর এঁরাও মহিন্দারদের নিয়ে লিখেছেন, নলিনী, ভগীরথ এরা প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ভূমিরাজস্ব দপ্তরে কাজের সূত্রে ওদের দেখেছেন। আমিও কিছুটা কাজের সূত্রে। শৈবাল মিত্র রাজনৈতিক কারণে কিছুদিন গাঁয়ে থেকেছেন। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী সরকারী আমলা ছিলেন না। শুধুমাত্র প্রাণের তাগিদে, সহমর্মিতা বোধের কারণে, প্রান্তিক জীবনের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। গল্প লেখার রসদ জোগাড় করার জন্য উনি দেড়-দু দিনের গ্রাম সফরে যাননি। অনেক নামজাদা লেখকরা সাত দিন ঘাটশিলাময় হাওয়া বদল সেরে আদিবাসী জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখে ফেলেন।

কর্মসূত্রে চাইবাসা গিয়েছিলেন। ওখানে হো-মুণ্ডাদের জীবন কিছুটা দেখেছি। কিন্তু সে তো উপর থেকে দেখা। ওদের জীবনে জীবন না জড়াতে পারলে কি করে ওদের নিয়ে সার্থক লেখা লিখব? মহাশ্বেতা পেরেছেন জড়াতে পেরেছিলেন বলেই।

ইতিহাস মহাশ্বেতাকে ভীষণ টানে। যুদ্ধের ইতিহাস ও বঞ্চনার ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস তো হাত ধরাধরি করেই চলে। ঝাঁসির রানি তো ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই লেখা। কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু উপন্যাসও ইতিহাস আশ্রিত। যে ইতিহাস স্কলারের ভোগ্য নয়। মধ্যযুগের রাঢ় বাংলার এক প্রান্তিক যুবকের কবি হওয়ার যুদ্ধের কাহিনী। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরের জনজাতির কৃষ্টি, বিশ্বাস, এসবের প্রতি মহাশ্বেতার ভীষণ রকমের ঝোঁক। বিভিন্ন কাহিনীতে উঠে এসেছে তাঁর খনন। জনসমাজের গভীর গোপন জায়গাগুলি খুঁড়ে বের করার প্রক্রিয়ায় সামিল পরবর্তী নলিনী - অমর - অভিজিত - আফসার ছাড়িয়ে এ সময়ের অনেক তরুণ লেখক। এরা সবাই মহাশ্বেতারই উত্তরাধিকারী। মহাশ্বেতাই এই কাজ প্রথম করেছেন বাংলায় এমন নয়, সতীনাথ - তারাশংকর - মানিকরাও করেছেন। কিন্তু মহাশ্বেতা খুব বেশি করে করেছেন এবং এই কাজে পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

ঝাড়খণ্ডের কথা বলছিলাম। ওখানে বিরসার উপর একটা ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে অরণ্যের অধিকার আবার পড়ি। সেই সঙ্গে পড়ি কুমার সুরেশ সিং-এর লেখা Dust Storm and Hanging Mist. বুঝি ওই বইটাতে আকরগ্রন্থ। অরণ্যের অধিকারে বিরসার চরিত্র চিত্রণে তিনি সুরেশ সিং -এর মতই গ্রহণ করেছেন। সুরেশ সিং ছিলেন ওই অঞ্চলের চারটি মহকুমার এস ডি ও। আমি বিরসার জন্মস্থানে গিয়েছি। ওর জন্মস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে। দু'জায়গাতেই যাই। দু'রকম লোককথা শুনি। ওর স্কুলে যাই। বিরসার মাতুলালয়, যেখানে বৃটিশের হাতে ধরা পড়েছেন, ওখানেও যাই। উপলব্ধি করি, জনমানসে বিরসা যতটা বীর তার চেয়েও বেশি তিনি ধর্মপ্রচারক। বিরসাপন্থী বিরসাইতিদের গ্রামেও যাই। বিরসাকে নিয়ে নতুন একটা উপন্যাস লিখব, কিন্তু সেই সাহস অর্জন

করতে পারলাম না। আমি উপন্যাস লিখলে একটা উপন্যাস লেখার জন্যই লিখব। কিন্তু মহাশ্বেতা লিখেছিলেন সামাজিক কর্তব্য হিসেবে। বিরসার সহযোদ্ধা ধানীর উত্তরপুরুষ চোট্টি মুণ্ডাও ওই অঞ্চলের oral epic-এর নায়ক। মুখে মুখে চোট্টির গল্প ফেরে। মহাশ্বেতা ওই কাহিনীর রূপ দিলেন চোট্টি মুণ্ডা এবং তাঁর তীর উপন্যাসে। এক্ষেত্রে কোন আকরগ্রন্থ ছিল না। ছিল শুধু লোককথা। মহাশ্বেতা কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তবে অবাক হয়েছি।

ক্যান সাবআলটার্ন স্পীক? গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিখ্যাত লেখা। বলা যায় মহাশ্বেতার লেখাই ওর ওই থিসিসের প্রেরণা। পদার্থবিদ্যায় দেখেছি পীড়ন (stress) বস্তুকে সংকুচিত করে। পীড়ন মানুষকেও বোবা করে দেয়। সেই বলতে না পারা কথাই মহাশ্বেতা বারবার বলেন। এ প্রসঙ্গে নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ওড়িশার কেন্দুঝর জেলায় কিছুদিন কর্মসূত্রে ছিলাম। ওখানে কৃষি মজুররা সরকারি নির্দেশিকার চেয়ে অনেক কম মজুরি পেত— যেমন হয় আর কি। কেন্দুঝর শহরে একটি ছোট বেতার কেন্দ্র আছে। সেই সময় বিজু পট্টনায়ক ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। একদিন তাঁর একটা ভাষণ কটক কেন্দ্র থেকে রিলে করার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ যেহেতু, ভেবেছিলাম তখন সব রেডিও খোলা থাকবে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সহ সব আমলারাই রেডিও খোলা রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার ঠিক আগে কৃষকদের জন্য অনুষ্ঠান হয়। ভাবলাম, ওই সময় কৃষিমজুরি নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করি, মজুররা কত কম পাছে সবাই জানুক। গ্রাম থেকে কয়েকজন কৃষ্টি মজুরকে নিয়ে এলাম। পরিকল্পনা ছিল কৃষি মজুরির সরকারী নির্দেশিকা নিয়ে একজন কিছু বলবেন, তারপর মজুররা নিজেদের কথা বলবে, জানাবে নির্দ্ধারিত মজুরি বিয়াল্লিশ টাকা এই প্রথম শুনছে। কুড়ি টাকার বেশি ওরা কখনোই পায় না। কুড়ি টাকায় বেঁচে থাকা যায় না। এক কেজি চাল দশ টাকা। কেরোসিন, আলু, পেঁয়াজ কেনার পর সব্জি বা ডাল কেনার কোন পয়সা থাকে না। জামাকাপড় — ওষুধপথ্য কেনার জন্য কিছুই থাকে না... ইত্যাদি। কিনতু ওরা বল্লেন— কুড়ি টাকা পাচ্ছি, ওতে ভাত-হাড়িয়া-বিড়ি হয়ে যায়। কেরোসিন কি হবে? কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না হয়ে যায়। মালিকরা মুড়ি দেয়, বিড়িও দেয়। জঙ্গলে কন্দ আছে, শালপাতাও আছে। ভগবান ঠিকই জুটিয়ে দিচ্ছেন। অনুষ্ঠানটা লাইভ হয়েছিল। ব্যাপারটা মাঠে মারা গেল। ভাবলাম রেকর্ড করে নি, পরে বাজিয়ে দেব। একজন ওড়িয়াভাষী স্তানীয় লোককে দিয়ে বোঝানো হ'ল, কিন্তু রেকর্ড করার সময় যা বলল তার মূল কথা হল— কুড়ি বাইশ টাকায় দিব্যি চালানো যায়। ওরা যে কথা বলতে পারেন না, কইতে কথা বাধে এমন নয়, নিজেদের অবস্থা এবং অবস্থানটাই বোঝেন না, ওদের কথাই মহাশ্বেতাদি বলেন।

১৯৭৫ থেকে পঁচানব্বই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মহাশ্বেতার কলমে মূক মানুষের ভাষা ফুটে উঠেছে। প্রায়শই মূল লেখার সঙ্গে জড়িয়েছে ইতিহাস। শুধু লোধা-শবর-মুণ্ডা-হো নয়, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়েও লিখেছেন তিনি।

মহাশ্বেতার চরিত্রগুলি রাজনৈতিক চরিত্র হয়েও কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে উঠে না। জল গল্পের বিবেকবান মাস্টারমশাই কংগ্রেসী। এম ডব্লু বনাম লখিন্দ গল্পের সিপিআই নেতাকে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে। বসাই টুডু গল্পের কালীপদ সাঁতরা একজন সৎ আদর্শনিষ্ঠ সিপিএম কর্মী, দ্রৌপদী কিন্তু নকশাল কর্মী।

সে সময়ের নকশাল আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করলেও আন্দোলনের পদ্ধতির প্রতি সমর্থন ছিল না ওঁর। বিভিন্ন সময়ে আলাপচারিতায় এটা দেখেছি। পরবর্তী কালে মাওবাদী আন্দোলন নামে যেটা চলেছে এ সম্পর্কে মহাশ্বেতাদির স্পষ্ট বক্তব্য কি সেটা ঠিক মত পাইনি। এই 'মাও আন্দোলনের' পক্ষে বা বিপক্ষে কোন লেখাই পড়িনি। তবে যৌথ অভিযান প্রত্যাহার করতে বলেছেন কারণ পুলিশ মিলিটারি নিরীহ আদিবাসী এবং অধিবাসীদের অহেতুক অত্যাচার করে। কিন্তু মাওবাদীরাও তো গরীব মানুষদের মেরে ফেলেছে, এব্যাপারে ওঁর প্রতিক্রিয়া পাইনি তেমন ভাবে। উনি যদি এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করতেন, তবে হত্যাকান্ড বন্ধ হত না হয়তো, কিন্তু আমাদের ভালে লাগতো।

একবার বিদেশের এক বইমেলায় দেখেছি মহাশ্বেতার বইয়ের চীনা অনুবাদ, জাপানী অনুবাদ, বিভিন্ন ইয়োরপীয় ভাষায় তো আছেই। গর্বে বুক ভরে ওঠে। ভারতীয় প্যাভেলিয়নে ম্যাক্সি - পরা মহাশ্বেতাদির ছবি। আবেগে চোখ দিয়ে জল এসে যায়। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা হয়েছিল ওঁর। পেতেই পারতেন। কী যে ভালো হত। আমি তো বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র-তারাশংকর -বিভূতি-মানিককে দেখিনি, মহাশ্বেতাকে দেখেছি। যদি বেঁচে থাকি, নাতি নাতনীর কাছে সেই গল্প করতে পারব। মহাশ্বেতার গল্পে জরুরী অবস্থায় সিদ্ধার্থশংকরের আমল দেখেছি, তারও আগে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রও দেখেছি। স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প নামে যে সংকলনটি আছে, তার রচনাকালে হল ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী, সিদ্ধার্থশংকর এবং জ্যোতি বসুর আমল, এই এফ ৩৭ : রিপোর্টাজ নামে একটা গল্প জরুরী অবস্থার সময়কার গল্প, এবং কিছুদিন পরে বামফ্রন্টের জমানায় লেখা নিহত ও মৃত গল্পের থানা - পুলিশের উল্টি খাওয়া দেখিয়ে দেন। এইসব লেখাগুলি ভাবীকালের সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণায় কাজে লাগবে, ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগবে।

৮০র দশকের প্রথম দিক থেকেই তিনি রাঢ় অঞ্চল, পালামৌ এলাকায় বন্ডেড্ লেবারদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। 'কাজ' মানে গবেষণা নয়, ওদের সংগঠিত করার কাজ, ওদের মুখপাত্রের কাজ, ওদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে লেখা নয়, প্রশাসন এবং উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ। একদিন মহাশ্বেতাকে বলেছিলাম লেবার সমিতি করে অনেকটাই সময় যায় আপনার, লেখার কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে তো...। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একটা মৃদু খিস্তি দিয়ে বলেছিলেন— এতে বয়েই গেল। লেখাটার চেয়ে কাজটা বেশি ইম্পর্টান্ট।

প্রথম দিনের কথাটাই হচ্ছিল, কথায় কথায় সরে এসেছি। বলছিলাম একজন দাড়ি-না-কাটা মানুষের চুল আঁচড়ানোর কথা। ছেলেটাকে দশটা টাকা দিলেন মহাশ্বেতাদি, আর একটা চিঠি দিলেন। বুঝিয়ে বললেন টু বি দোতলা বাস থেকে কোন স্টপেজে নামতে হবে, তারপর চিঠিটা নিয়ে কোথায় যেতে হবে। বুঝলাম ছেলেটিকে কোথাও পাঠাচ্ছেন উনি।

এরকম একটি ছেলেকে, আমার কাছেও পাঠিয়েছিলেন মহাশ্বেতাদি। ছেলেটি সাঁওতাল, ভালো লেখে। আমি তখন কটক-এ। ১৯৮২ সালই হবে। দূরদর্শনে কাজ করছি। চিঠিতে বলা ছিল যাকে পাঠালাম যে অতি ভালো ছেলে, প্রতিভাবান, যদি ওকে কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি...।

আমি তো ছোটখাটো চাকরি করতাম। আমার পক্ষে তো সম্ভব ছিল না। কোন কিছু 'ব্যবস্থা' করার। পারিনি। কিছুদিন পরে দেখলাম ছেলেটিকে আমাদের দপ্তরেই কাজ পেয়েছে, ইউ. পি. এস. সি-র মাধ্যমে। ছেলেটির নাম পরিমল হেমব্রম। সাঁওতালি ভাষার একজন গল্পকার। মার্শাল হেমব্রম নামে লেখেন। নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন। ওর পারিবারিক অবস্থাও বেশ ভালো ছিল আগে থেকেই। তবুও দিদি ওর চাকরির জন্য আমার কাছে চিঠি দিলেন কেন? আদিবাসীদের জন্য ওর একটু বেশি বেশি আছে— এরকম ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হ'ল ওর হৃদয়ে অনেক কিছুই বেশি বেশি আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটাও বেশি বেশি আছে। মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছেটাও বেশি বেশি আছে। অভিজিত সেন আমাকে বলেছিলেন ওকে সঙ্গে নিয়ে মহাশ্বেতা একদিন কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলেছিলেন, ছেলেটি বালুরঘাটে থাকে, বড় ভাল লেখে। একজনকে বলেছিলেন— জিজ্ঞাসা করেছিলেন না, আফটার মহাশ্বেতা হু?— উত্তরটা নিয়ে এলাম। মহাশ্বেতা অভিজিত সেনের গল্প নিয়ে দিয়েছিলেন এক্ষণ সম্পাদককে, প্রমা, অনুষ্টুপ সম্পাদককে। আরও অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে।

আমাকেও প্রথম দিনেই বলেছিলেন— গল্প ছাপতে কোন অসুবিধে হলে বলতে। বলতে হয়নি কখনো। গল্প ছাপতে অসুবিধে হয়নি কখনো, কিন্তু অসুবিধে হয়েছে লিখতে। ঠিক মত লিখতে। ওঁর মত লিখতে। কারণ ওঁর মত শিকড়ে ছড়াতে পারিনি আমি। যখন ফিরছি, সেই প্রথম দিনের পর, সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এখন ছাপা নেই, পরে এসে একটা বিল বই নিয়ে যেতে। যদি পারি কিছু চাঁদা যদি তুলে দিই, খেড়িয়া-শবর কল্যাণ...।

এমন ব্যাপারটা এরকম হয়...কোন অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলে, কিম্বু কোন বুড়ির মাথায় বস্তা উড়িয়ে দিলে, কিম্বু কোন মানুষের চিকিৎসার জন্য টাকা তুলে দিতে পারলে, কিম্বা অফিসের কোন ফল্স মেডিকেল বিলকে নাকচ করে দিতে পারলে, কিম্বা কোন নেতাবাবুর মুখের উপর 'আমায় দিয়ে আপনি এই কাজ করাতে পারবেন না' বলে দিতে পারলে মনে হয় ওর সঙ্গে আমিও একটু একটু আছি।